

Vol. 44 | No. 1 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কুমারখালীর শিক্ষিতদের ভাষা

Volume	44
Issue	1
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ
Published online	October 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v44i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i1.5
Pages	৫৫-৭৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কুমারখালীর শিক্ষিতদের ভাষা

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

বাংলাদেশ আদমশুমারি ১৯৯১, কমিউনিটি সিরিজ, জেলা : কুষ্টিয়া থেকে কুমারখালী সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কুমারখালী থানা জনসংখ্যার দিক থেকে কুষ্টিয়া জেলার তৃতীয় বৃহত্তম থানা হিসেবে অবস্থান করে আসছে। কুমারখালী থানার নামকরণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি মূল হিসেবে অবস্থান করছে তা কেউই ঠিক মতো বলতে পারেন না। পূর্বে এ এলাকার নাম ছিল 'তুলশীডাংগা'। মোগল শাসনামলের সময় এই এলাকায় একজন রাজস্ব সংগ্রাহক নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যাঁর নাম ছিল 'কামার কুলি'। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, কুমারখালী থানা ঐ ব্যক্তির নামানুসারেই পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করেছে।

নদীসহ কুমারখালী থানার আয়তন প্রায় ২৬৫.৮৯ বর্গকিলোমিটার। কুমারখালী থানায় অবস্থিত নদীর আয়তন প্রায় ১১.৯১ বর্গকিলোমিটার। এই থানা ২৩.৪৪′ ও ২৩.৫৮′ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৯.০৯′ ও ৮৯.২২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। কুমারখালী থানার মোট জনসংখ্যা ২,৬৯,০০৮ জন। তার মধ্যে ১,৩৯,২৫৫ জন পুরুষ এবং ১,২৯,৭৫৩ জন মহিলা। কুমারখালীর জনসংখ্যার মধ্যে গ্রামে বাস করে ২,৫৭,৩৩৩ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১,৩৩,১৯৩ জন এবং মহিলা ১,২৪,১৪০ জন। শহরে বাস করে ১১,৬৭৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৬,০৬২ জন। এবং মহিলা ৫,৬১৩ জন। কুমারখালীতে ৭ বছর ও তার উপরের বয়সের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিতের হার ২৪.৯% । তার মধ্যে পুরুষ ৩০.৩% এবং মহিলা ১৯.২% । কুমারখালী থানার উত্তরে পাবনা সদর থানা, পূর্বে খোকসা থানা এবং রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানা, দক্ষিণে খোকসা থানা এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানা এবং পশ্চিমে কুষ্টিয়া সদর থানা অবস্থিত।

কুমারখালীর শিক্ষিতদের ভাষা আলোচনা করতে হলে শিক্ষিত বলতে কি বোঝায় তা জেনে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাক্ষর এবং নিরক্ষর—এই দুই শ্রেণীর সাথে আমাদের পরিচয় রয়েছে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোককে স্বাক্ষর এবং অক্ষরজ্ঞানশূন্য লোককে নিরক্ষর বলা হয়ে থাকে।

স্বাক্ষর লোকের মধ্যে আবার পার্থক্য আছে। স্বাক্ষর বলতে আমরা কোন শ্রেণীকে বুঝি বা বুঝিয়ে থাকি? কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকেই শুধুমাত্র নিজের নাম ছাড়া অন্য কিছু লিখতে বা পড়তে পারেন না। এই শ্রেণী নিরক্ষরদের কাছাকাছি। শিক্ষিত বলতে অনেকে ভেবে থাকেন যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাঁদের বোঝায়। নিজের প্রয়োজনে পড়া, লেখা, বলা,

* প্রভাষক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

শোনা এবং অন্যান্য কার্যক্রমে শিক্ষাকে ব্যবহার করতে পারেন, এই শ্রেণীকে কেউ কেউ শিক্ষিত বলে থাকেন। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও কোন ব্যক্তি স্বউদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। শুধু বই পড়ে বা লেখে নয়, শিক্ষা গ্রহণ করা যায় কারো সাথে আলাপ করে, সমাজের নানাবিধ চিত্র দেখে, পূর্বকালে ঘটে যাওয়া ঘটনা শুনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। তাহলে, প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেটধারী শ্রেণী ছাড়াও স্বশিক্ষার মাধ্যমে যাঁরা শিক্ষিত হয়েছেন, তাঁরাও শিক্ষিতদের অন্তর্ভুক্ত। সংগত কারণেই একটি প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে, যাঁরা নিরক্ষর, কিন্তু নিজ মেধা ও সৃষ্টিশীল কর্মের জন্য কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছেন বা হয়ে থাকেন, তাঁরা কোন শ্রেণীর শিক্ষিতদের তালিকায় পড়েন ? কুমারখালীর ছেঁউড়িয়াতে বাউল সম্রাট লালন বসবাস করতেন। "লালন সম্ভবত অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না। উনিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও তাঁর হস্তলিখিত কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তাঁর শিষ্যদের হস্তলিখিত দুটি গানের খাতা পাওয়া গেছে। তাও অজস্র ভুলে ভরা; পুঁথির মতো টানা লেখা, বাম দিক থেকে পড়তে হয়। অর্থাৎ শিষ্যরাও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না। লালন মুখে মুখে গান রচনা করে নিজেই গাইতেন। শিষ্যরা সে গান শুনে ও গেয়ে স্মৃতিতে ধারণ করতেন।"[১] লালনের ক্ষেত্রে অথবা সৃষ্টিশীল মহৎ প্রতিভাধর ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষিত শব্দটির প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের বিষয়টি কখনো যে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না, তা নয়। অনেকেই মনে করেন, শিক্ষিত শব্দটি অক্ষরজ্ঞানশূন্য ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শব্দ দুটিকে পাশ কাটিয়ে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে আমরা এ গবেষণায়, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং নিজের প্রয়োজন মতো অক্ষরজ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন, তাঁদেরকেই বুঝাব।

কুমারখালীর শিক্ষিতদের ভাষা আলোচনায় উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা 'ক্ষেত্র ভাষাতত্ত্ব' (Field Linguistics) বা জরিপ ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর করব। সে জন্য ভাষিক এলাকায় কাজ করার প্রয়োজন হয়েছে। সরাসরি কুমারখালী অঞ্চলে গিয়ে সে এলাকার জনগোষ্ঠীর জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে ব্যবহৃত ভাষাকে উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ভাষা ব্যবহারকারীর অজ্ঞাতসারে ব্যবহৃত ভাষাকেই গ্রহণ করেছি। ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একই ভাষা একই সমাজে নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নানাভাবে ব্যবহৃত হওয়ার অবশ্যই কিছু না কিছু কারণ থাকে। ভাষাবিজ্ঞানীরা কোন এলাকার ভাষা সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর রাখেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো, সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বয়স, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ইত্যাদি।

স্যার গ্রীয়ার্সনের মতে, হুগলীর শিক্ষিত ভাষাভাষীর ব্যবহৃত বাংলা রূপকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আদর্শ চলিত বাংলা। অন্যদিকে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কলকাতা ও নদীয়ার শিক্ষিত ভাষাভাষীর ব্যবহৃত বাংলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে প্রমিত বাংলা। এ ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি, কলকাতা, হুগলী ও নদীয়ার ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বর্তমানে প্রচলিত বাংলার রূপ। কুমারখালী যেহেতু নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, সেজন্য কুমারখালীর শিক্ষিতদের ভাষা প্রমিত ভাষা থেকে বেশি দূরে অবস্থান করে না। বর্ণ বিপর্যয়, ঘোষতা-অঘোষতা,

স্বরধ্বনিগত ব্যবহার ইত্যাদি কিছু বিষয়ে প্রমিত ভাষার সাথে কুমারখালীর ভাষার পার্থক্য রয়েছে—যা উপাত্ত সংগ্রহের পর নজরে এসেছে।

ভাষার আলোচনা নানাভাবে হতে পারে. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভাষার আন্তর প্রক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে পৃথকীকরণ করে আলোচনা করা যায়। ভাষায় প্রয়োগিক দিক হিসেবে সমাজে ভাষার ব্যবহার ও শ্রেণী নির্দেশ করা যায়। অন্যদিকে সাধারণভাবেও ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। কুমারখালীর ভাষার উপর এর পূর্বে কোন গবেষণা হয়নি। বিচ্ছিন্ন কিংবা খণ্ডিত কোন অংশের বিশেষ দিক আলোচনায় না এনে কুমারখালীর শিক্ষিত সমাজে ভাষার ব্যবহার কেমন তা-ই এ গবেষণায় স্থান পাবে।

কুমারখালীর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা আলোচনার পূর্বে কুমারখালীর শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন তা জানার আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া কুমারখালীতে কখন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল তাও জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে ইংরেজ শাসনামল থেকে কুমারখালীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক থাকে। শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন শৃঙ্খলা দেখা যায় তা পূর্বে ছিল না. না থাকার কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বেকার সঠিক ইতিহাস না জানা গেলেও কুমারখালীতে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মক্তব. টোল. গুরুগৃহের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ—এরকম পদ্ধতি চালু ছিল। ১৭৫৭ সালে মিশনারি ম্যাকসমুলার-এর জরিপ থেকে কুমারখালীর তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। সে সময় কুমারখালীতে কয়েকটি স্থানীয় বিদ্যালয় ছিল—এগুলো টোল এবং পারিবারিক স্কুল।

কুমারখালীর বর্তমান তহশীল অফিসের প্রায় ৮০০ গজ দক্ষিণে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তীর পিতা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর একটি টোলের সন্ধান পাওয়া যায়। যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে এই টোলটি ব্রিটিশ আমলে খুবই নামকরা ছিল। তবে শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা দিতে হতো নবদ্বীপ গিয়ে।[২] কুমারখালীতে যে একটি শিক্ষার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তা অতি সহজেই বোঝা যায়। ১৮৫৪ সালে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার নিজ বাসভবনে একটি বিদ্যালয় চালু করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেখানে যত্নের সাথে শিক্ষা দেওয়া হতো। এটি ছিল একটি বাংলা স্কুল। তিনি যে বাংলা স্কুল খুলেছিলেন. সে বিষয়ে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখের *সম্বাদ প্রভাকরে* দ্বারিকানাথ প্রামাণিক লিখেছিলেন.

> কতিপয় সজ্জনের বিশেষ উৎসাহে এই কুমারখালীতে একটি বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পরে ছাত্রবৃন্দের ও আয়ের ক্রমশ উন্নতি হওয়াতে পূর্বভাগের ইন্সপেক্টর হেনরী উড্রু' সাহেব মহাশয় কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের অনুরোধক্রমে অত্রস্থলে আগমন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী উত্তমরূপে দেখিয়া গভর্নমেন্টের সাহায্যাধীন করাইয়াছিলেন।[৩]

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে কুমারখালীর এম.এন. হাইস্কুলকে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা যেতে পারে। এ বিদ্যালয়টি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে নীলকুঠিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রী মথুরানাথ। তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা না জানলেও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এ বিদ্যালয়টি কুষ্টিয়া জেলার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। রায় বাহাদুর জলধর সেন, অক্ষয় কুমার মৈত্র, রমেশচন্দ্র মুজমদার এ সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি এ স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।[৪] মথুরানাথ বাবু বিদ্যালয় স্থাপন করেই চুপচাপ বসে থাকেননি। বিদ্যালয়টির সরকারি মঞ্জুরি পাওয়ার বিষয়টিও তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। যা ছিল অনেকটা কল্পকাহিনীর মতো।

বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করার বিষয়টি তখনকার দিনে বেশ কষ্টকর ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা থেকে পানিপথে জাহাজে করে গঙ্গা, পদ্মা, গড়াই হয়ে ঢাকা যাবেন। সে সময়ে গড়াই নদীতে বছরের সব সময়ই পানি থাকত, বড় বড় নৌযান ও জাহাজ চলাচল করত। নদীর অবস্থান ছিল এম. এন. স্কুল থেকে দু'মাইল দক্ষিণে। তবে নদী থেকে ছোট্ট একটি খাল এম.এন. স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। হার্ডিঞ্জ সাহেব কুমারখালীর পাশ দিয়ে ঢাকা যাবেন, এ সংবাদ জেনে মথুরানাথ বাবু কয়েকটি বজরা নৌকা সাজিয়ে নদীর মাঝে অবরোধ সৃষ্টি করে রাখলেন। তিনি নিজে লাল পতাকা হাতে মাঝের নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাহাজ থেমে গেলে, মথুরানাথ বাবুর নৌকা ধীরে জাহাজের দিকে এগোয়। তিনি ইঙ্গিত করে দেখালেন যে হার্ডিঞ্জ সাহেবের সাথে দেখা করতে চান। জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো। মথুরানাথ জাহাজে উঠলেন, দোভাষীর মাধ্যমে হার্ডিঞ্জ সাহেবকে জানানো হলো যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাহেবকে দয়া করে দেখতে হবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজি হলেন এবং দলবলসহ নৌকায় করে খাল হয়ে তাঁরা এম.এন. স্কুলে আসেন। তাঁদের দেখে, বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রানীর জয়গান গেয়ে ও হার্ডিঞ্জ সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার। তিনি ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন। লর্ড সাহেব শ্রেণীকক্ষে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কথাবার্তা বলে খুব খুশি হলেন। তেজস্বী পুরুষ মথুরানাথ বাবুকে অনেক সাধুবাদ জানিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ বিদায় নেওয়ার কিছুদিন পরেই এম.এন. স্কুল সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত হয়।[৫]

কুমারখালীতে যে শুধু বালকদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়। কুমারখালীতে যতগুলো বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে দুটি বিদ্যালয় সর্বগুণে গুণান্বিত। একটি হলো এম. এন. বিদ্যালয়, অপরটি কুমারখালী বালিকা বিদ্যালয়। কুমারখালী বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ছিলেন এ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক। শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই, এ বিষয়টি কুমারখালীর মানুষেরা জেনেছিলেন বহুকাল পূর্বেই। নারীকে গৃহে বন্দি করে রেখে সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়, সে বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছিল। নারী-শিক্ষার যে অগ্রগতি প্রয়োজন তা এ এলাকার লোক যে অনুধাবন করেছিল, বিষয়টি অতি সহজেই বোঝা যায়, কুমারখালীতে বালিকা বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা লক্ষ করে। মূলত কুমারখালীর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা কেমন তা বিশ্লেষণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথা জানা থাকলে শিক্ষিতদের ভাষার বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। শ্রেণীবিভাগের প্রথমেই এসে যায় লিঙ্গগত শ্রেণী অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী। এছাড়া আছে ধর্মভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ। কুমারখালীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুটি ধর্মের জনগোষ্ঠীকে পাশাপাশি বসবাস করতে দেখা যায়। মুসলমান এবং হিন্দু। এছাড়াও আছে শিক্ষিতের নানা স্তর। যেমন উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, মোটামুটি শিক্ষিত ইত্যাদি। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আছে পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ।

শিক্ষিত লোক বলতে যে তার নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারে, তাকেও বোঝানো হয়। কিন্তু শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করাকে শিক্ষিতদের তালিকায় ফেলা কতটুকু বাস্তবতা সমর্থিত তা ভাববার অবকাশ আছে। বিষয়টি প্রবন্ধের শুরুতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, নাম স্বাক্ষর করতে লেখাপড়া করার খুব একটা দরকার হয় না। কোন একজন লোকের কাছ থেকে শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষরের জন্য যে অক্ষর বা প্রতীকগুলি প্রয়োজন সেগুলি শিখে নিলেই চলে। গ্রামে এরকম প্রবণতা দেখা যায়। যারা শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে তাদের কথাবার্তা অনেকটা অশিক্ষিতদের (নিরক্ষর) মতো।

এবার কুমারখালীতে ব্যবহৃত একটি বাক্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। মোটামুটি শিক্ষিত লোক একটি ছেলেকে বলছে, "পানি ঢালতিছির ক্যা?" অর্থাৎ তার নিজের ছেলে অথবা নিকট আত্মীয়ের ছেলে পানি ফেলছিল এমন জায়গায় যেখানে পানি ফেলা ঠিক না। তাই এ ধরনের বাক্য বলে তাকে পানি ফেলতে নিষেধ করা হচ্ছে।

শিক্ষিত লোক যারা কিছুটা বাইরে যাতায়াত করেন এবং প্রচলিত ভাষার প্রতি সচেতন তাঁরা এক্ষেত্রে বলেন, "পানি ঢালছো ক্যান?" যাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি বেশ সচেতন তাঁরা বলেন, "পানি ফেলছো কেন?" তাহলে বাক্যটির যে প্রায়োগিক রূপ তা হলো :

		অর্থ
মোটামুটি শিক্ষিত	পানি ঢালতিছির ক্যা?	পানি ফেলার কারণ কী/
শিক্ষিত	পানি ঢালছো ক্যান?	পানি ফেলতে নিষেধ করা
উচ্চশিক্ষিত	পানি ফেলছো কেন?	

কুমারখালীর মুসলমান পরিবারে জল বলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। সবাই জল না বলে পানি বলে থাকেন। কিন্তু হিন্দু পরিবারের লোকেরা পানি না বলে জল বলে থাকেন। তবে ইদানীং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে অনেক হিন্দু বাঙালি জল-এর পরিবর্তে মাঝে-মধ্যে পানি বলে থাকেন। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বলতে এখানে বোঝান হচ্ছে যে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করার জন্য, মুসলমানদের সাথে কথা বলা বা মেলামেশার মাধ্যমে, আরও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ

হওয়ার জন্যই শব্দ ব্যবহারের এ পরিবর্তন ঘটেছে। জল বাংলা শব্দ কিন্তু মুসলমান সমাজে এর ব্যবহার এতই কম যে জল শব্দটি দ্বারা হিন্দুয়ানী ভাব পরিলক্ষিত হয়।

'ঢালতিছির' শব্দের দ্বারা বর্তমান সময়ে তরল পদার্থ ফেলা অর্থ বোঝায় এবং 'ক্যা' শব্দের অর্থ হলো 'কেন'। 'ঢালতিছির' শব্দের কিছুটা মার্জিত রূপ বা আধুনিক রূপ হলো 'ঢালছো'। 'ক্যা' শব্দটি দ্বারা প্রশ্নবোধক অর্থ বোঝানোর সাথে সাথে কখনও বা 'নিষেধ' করা বোঝান হয়ে থাকে। যাদের জন্ম কুমারখালীতে এবং যারা চাকরি বা ব্যবসায়িক কারণে কুমারখালীতে বাস করছেন, তাদের কথা বার্তার মধ্যে কুমারখালী এলাকার ভাষার প্রয়োগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রামে বাড়ি এবং একই গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করে গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন একজন লোক, তিনি এম.কম. পাস। তিনি কুমারখালীর পাশের থানা খোকসা কলেজের শিক্ষক। তিনি ধনী ও গ্রাম প্রধানের সন্তান এবং তার স্ত্রীও মোটামুটি শিক্ষিত, দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ভদ্রলোক বাড়িতে সব সময়ই নিজের এলাকার ভাষায় কথা বলেন। যেমন তিনি তার ছোট মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "ছ্যামায় ছ্যামায় থাহে, গায় জ্বর আসে গেছে মনে হয়।"[৭]

উপরের বাক্যটির অর্থ হলো : "ছায়ায় ছায়ায় থাকে, সম্ভবত গায়ে জ্বর।" এখানে 'গা' অর্থ শরীর এবং যাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ বক্তার মেয়ের নাম অনুপস্থিত রয়েছে। বাক্যটিকে সম্ভাব্য তিনটি স্তরে দেখান যেতে পারে।

- প্রমিত ভাষার প্রতি সচেতন (শিক্ষিত ব্যক্তি) : ছ্যামায় ছ্যামায় থাকে গায়ে সম্ভবত জ্বর।
- প্রমিত ভাষার প্রতি অতি সচেতন (শিক্ষিত ব্যক্তি) : ছায়ায় ছায়ায় থাকে, শরীরে সম্ভবত জ্বর।
- প্রমিত ভাষার প্রতি অসচেতন (শিক্ষিত ব্যক্তি): ছ্যামায় ছ্যামায় থাহে, গায় জ্বর আসে গেছে মনে হয়।

উপরের বাক্য দ্বারা উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত, মোটামুটি শিক্ষিতদের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যের যে ধারণা তা কিছুটা জটিল রূপ ধারণ করেছে। তার কারণ উপরের বাক্যটির প্রতিটি ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষিতদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রায়োগিক রীতি দেখান হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে একটি বড় দিক হলো সামাজিক অবস্থার দিক। বাড়িতে যে ভাষায় একজন শিক্ষিত অথবা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কথা বলেন, কর্মক্ষেত্রে কিন্তু তিনি তা করেন না।

> যে ব্যক্তি উপভাষা অঞ্চল থেকে আগত,তিনি সাধারণভাবে তাঁর কর্মক্ষেত্রে তিনটি ভাষারূপ ব্যবহার করে থাকেন; ক. বাড়িতে আঞ্চলিক ভাষা; খ. সর্ব সাধারণের সঙ্গে প্রচলিত রূপ; গ. শিক্ষার প্রয়োজনে সাধু বাংলা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে তৃতীয় ধারার ব্যতিক্রম বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে সাহিত্যে ও পাঠ্যপুস্তকে চলিত ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সাধুভাষা ক্রমশ বর্জিত হচ্ছে।[৮]

একটি কথা প্রচলিত আছে যে, কুষ্টিয়া জেলার ভাষা প্রমিত ভাষার মতো। কুমারখালী কুষ্টিয়া জেলাতে অবস্থিত এবং এক সময় কুমারখালী নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নদীয়া জেলার ভাষা

আদর্শ বাংলার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কুমারখালীতে খুব একটা আঞ্চলিক ভাষা নেই। অর্থাৎ কুমারখালীর লোক প্রমিত ভাষায় কথা বলেন। কুমারখালীতে যে আঞ্চলিক ভাষা নেই তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না। আবার কুমারখালীতে এমন লোকও আছেন যাঁরা সত্যিকার অর্থেই চলিত বাংলায় কথা বলেন। উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি গ্রামের উদাহরণ দেওয়া যায় যে গ্রামের লোকেরা প্রায় প্রচলিত রীতিতে কথা বলেন, গ্রামটির নাম হলো ধর্মপাড়া। এ গ্রামের অধিকাংশ লোক হিন্দু এবং পেশায় 'কুমার'। কুমার অর্থাৎ মাটির পাত্র তৈরির মাধ্যমে এঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন। পেশায় কুমার হলেও অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দু অথবা শিক্ষিত মুসলমান থেকে এঁরা প্রমিত ভাষায় কথা বলেন এবং কথা বলার ধরন দেখে শিক্ষিত অশিক্ষিত বোঝা যায় না। এবার একটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো যা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্তরানুযায়ী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। 'বৃষ্টি' শব্দটির উচ্চারণ কুমারখালীতে নানাভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন :

মোটামুটি শিক্ষিত লোকেরা বলেন : বিরিষ্টি
শিক্ষিতরা বলেন : বিষ্টি
উচ্চশিক্ষিতরা বলেন : বৃষ্টি

উল্লেখ্য যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষার প্রতি সচেতনতার দিকটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কুমারখালীর শিক্ষিত লোক, যারা বাইরে অবস্থান করেন, যেমন, চাকরি অথবা লেখাপড়ার জন্য কিংবা বৈবাহিক কারণে মেয়েরা অন্যত্র গমন করেন, তাঁদের মধ্যে ভাষার উচ্চারণ সচেতনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুমারখালীতে অনেকেই প্রমিত ভাষায় কথা বলেন। প্রমিত ভাষা বলতে বোঝান হচ্ছে রেডিও, টেলিভিশন অথবা পত্র-পত্রিকায় যে চলিত ভাষার প্রচলন আছে সেই ভাষা অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকারিভাবে ভাষার যে রকম প্রচলন আছে ঠিক সে রকমভাবে ব্যবহৃত ভাষা। সরকারিভাবে ব্যবহৃত ভাষা যে সবক্ষেত্রে প্রমিতরূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ উচ্চারণ ঠিক থাকে তা কিন্তু নয়। অনেকেই 'গেছে' শব্দটি উচ্চারণ করে থাকেন 'গ্যাছে'। তবে কুমারখালীর শিক্ষিত লোকেরা 'গেছে' শব্দটিকে 'গেছে' অথবা 'গিয়েছে' বলে থাকেন; 'গ্যাছে' বলেন না। 'গেছে' শব্দটির প্রায়োগিক দিকের একটা উদাহরণ দিলে দেখা যায় :

ক. আবের মারা গেছে।

খ. আবের মারা গ্যাছে।

ক'. আবের মারা গেছে।

খ'. আবের মারা গিয়েছে।

উপরের উদাহরণের ক নং-এ 'আবের মারা গেছে' ভাষার প্রচলিত রূপ। 'গেছে' শব্দটিকে নাটক, সিনেমা অথবা রেডিও, টেলিভিশনে কখনও কখনও 'গ্যাছে' বলার প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে কুমারখালীতে ক' নং-এ 'গেছে' এবং খ' নং-এ 'গিয়েছে' বলা হয়ে থাকে। মারা যাওয়া অর্থে কখনও বা একাধিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি

মারা গেলে তার নামের পূর্বে 'জনাব' বলা হয় এবং 'মারা' যাওয়া না বলে 'ইন্তেকাল' করেছেন কিংবা 'ইহলোক ত্যাগ' করেছেন বলা হয়। যেমন, 'আবের মারা গেছে' বাক্যে আবের যদি সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় তাহলে বলা হয় :

- জনাব মোঃ আবেরউদ্দিন শেখ ইন্তেকাল করেছেন।
- জনাব মোঃ আবেরউদ্দিন শেখ ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু আবের যদি গরিব ও দিনমজুর হয় তাহলে আবেরের সম্পূর্ণ নাম অর্থাৎ মোঃ আবেরউদ্দিন শেখ এটাও রক্ষিত হয় না। তবে শেখ না হয়ে আবের সৈয়দ, মিয়া ইত্যাদিও হতে পারে।

শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত অশিক্ষিত গরিব লোকদের সঙ্গে খুব একটা মর্যাদা দিয়ে কথা বলেন না। বাবার বয়সী কোন লোকের সাথেও 'তুমি' সম্বোধন করে থাকেন। যেমন "কামাল চাচা কেমন আছো; তুমি নাকি একটা মুরগি বেচবা ?"

অর্থাৎ কামালকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, সে একটা মুরগি বিক্রি করবে কি না? তবে ভাষার ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা খুব একটা দেখা যায় না। কোন কোন শিক্ষিত লোক সবাইকেই 'আপনে' বলে সম্বোধন করেন।

আপনে বললে বাক্যটি হবে, "কামাল চাচা কেমন আছেন; আপনি নাকি একটা মুরগি বিক্রি করবেন ?" 'আপনি' সর্বনামের সাথে ক্রিয়ার একটা যোগসূত্র দেখা যায়। আপনি বললে বিক্রি করবেন অথবা 'বেচবেন' বলা হয়। বিক্রি করবা কিংবা বেচবা বলা হয় না।

কুমারখালীতে কিছু শব্দ আছে যা ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার মধ্যে একইভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন :

মুনি—ছেলে/মেয়েকে আদর করে ডাকা হয় অথবা ছোট শিশুকে বলা হয়।

গ্যাদা মুনি—শুধুমাত্র ছোট শিশুদের বলা হয়।

ছ্যাপ—থুতু।

'গ্যাদা মুনি'কে কেউ কেউ 'ছোট বাচ্চা' অথবা 'ছোট শিশু' বলে থাকেন। 'ছ্যাপ' শব্দটি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায় গ্রামের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে। তবে কুমারখালী পৌরসভা এলাকা অথবা গ্রামে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে 'ছ্যাপ' না বলে থুতু বলার প্রবণতা লক্ষণীয়। কখনও বা কাউকে দিয়ে কাজ করানোর উদ্দেশ্যে তাকে বলা হয়, "মুনি না ভাল, তুমি অবশ্যই কালকে আমার সঙ্গে দেখা করবে।" 'মুনি না ভাল' এমন বাক্য মহিলাদের বলতে শোনা যায়। তবে পুরুষেরা যে 'মুনি' বলে না তা নয়। পুরুষদের কথা বলার ধরন মহিলাদের থেকে কিছুটা অন্যরকম। পুরুষেরা সাধারণত ছোটদের সাথে আদেশের সুরে কথা বলেন এভাবে, "মুনি আমার সাথে তুমি কালকে একটু দেখা করো।" তাহলে বাক্য দুটি হলো :

- মুনি না ভাল, তুমি অবশ্যই আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করবে। (শিক্ষিত মহিলাদের ব্যবহৃত বাক্য)।

- মুনি আমার সাথে তুমি কালকে দেখা করো। (শিক্ষিত পুরুষদের ব্যবহৃত বাক্য)।

আপনে/আপনি, তুমি, তুই, আপনারা, আপনিরা, তোরা তোমরা ইত্যাদি সর্বনাম কুমারখালীতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে 'তুই' এবং 'আপনি' সর্বনামই বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ইংরেজিতে আপনি, তুমি, তুই-এর ব্যবহার বাংলার মতো নেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন : 'Where did you stay in Dhaka?' বাংলায় বাক্যটির অর্থ যা দাঁড়ায় তা হলো :

ক. আপনি ঢাকায় কোথায় ছিলেন ?
খ. তুমি ঢাকায় কোথায় ছিলে ?
গ. তুই ঢাকায় কোথায় ছিলি ?

উপরের উদাহরণে আপনি, তুমি এবং তুই সর্বনাম তিনটি ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি, তুমি এবং তুই ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ক্রিয়া ব্যবহারের যে বিষয়টি দেখা যাচ্ছে তা হলো, 'ছিলেন', 'ছিলে' এবং 'ছিলি'। অর্থাৎ 'এন', '-এ' এবং '-ই' প্রত্যয়ের যোগসূত্র রয়েছে। বাংলায় মর্যাদাসূচক সম্বোধন আছে। সেই মর্যাদার বিষয়টি ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মর্যাদার কিন্তু মাপকাঠি নেই। মাপকাঠি বলতে বোঝান হচ্ছে যে 'আপনি', 'তুমি' কিংবা 'তুই' কোথায় ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করে বলা যায় না। সামাজিকভাবে ভাষার ব্যবহারের তারতম্যের উপর আপনি, তুমি, তুই নির্ভরশীল। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় তা হলো 'আপনি', 'তুমি' ও 'তুই'-এর ক্ষেত্রে ক্রিয়া ব্যবহারের বিষয়টি সুস্পষ্ট। কুমারখালীর শিক্ষিত সমাজে 'আপনি', 'তুমি এবং 'তুই'-এর ব্যবহার রয়েছে।

> আপনি, তুমি, তুই/আপনারা, তোমরা, তোরা, তিনি, সে/তাঁরা, তারা, এগুলো নিলে দেখা যায়, আপনি, আপনারা, তিনি/ তাঁরা ব্যবহৃত হয় ধনী (এবং বয়স্ক) প্রসঙ্গে, তুমি/তোমরা ব্যবহৃত হয় মধ্যবিত্ত (এবং সমবয়সী) প্রসঙ্গে এবং তুই/ তোরা, সে/তারা ব্যবহৃত হয় নিম্নবিত্ত (এবং কমবয়সী) প্রসঙ্গে। ব্যক্তির বুলিভাণ্ডারে বিভিন্ন প্রকারভেদ নামে, ব্যক্তি অনুসারে একেকটি ব্যবহৃত হয়। সর্বনামের এ ব্যবহার থেকে বোঝা যায় সমাজে কমপক্ষে তিনটি শ্রেণী আছে এবং এতগুলো সর্বনাম থাকার মূলে সমাজের শ্রেণী বিভক্তি ভাষা সংগঠনে এর প্রভাব আরো কতদূর গড়িয়েছে তা বোঝা যায় সর্বনামের সাথে ক্রিয়ার অন্বয়সূচক বিভক্তি যথাক্রমে সম্মানসূচক, সাধারণ এবং তুচ্ছ বিভক্তি 'উন' '-ও' 'ইস' ইত্যাদি থেকে। উচ্চবিত্তের সাথে শুধু 'আপনি' ব্যবহার করলে হবে না, ক্রিয়া ব্যবহারেও সচেতন হতে হবে : 'আপনি কর' বললে হবে না, বলতে হবে 'আপনি করুন' অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যবহারের সময় ব্যক্তির শ্রেণীর কথা মনে রাখতে হয়। সুতরাং বাঙলায় শ্রেণীনিরপেক্ষ কোন ক্রিয়ার ব্যবহার নেই বলা চলে।[৯]

কুমারখালীতে শিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহার ও সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়স ও অর্থের বিষয়টি সব সময়ই যে বড় রকমের বিষয় হয়ে অবস্থান করে তা কিন্তু নয়। কুমারখালীতে আপনি এবং তুই সর্বনামটি ব্যক্তিক অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যয়। 'আপনি'-এর বহুবচন 'আপনারা' এবং 'তুই'-এর বহুবচন 'তোরা' ব্যবহৃত হয়। 'তুমি' যে ব্যবহৃত হয় না, তা নয়। তবে

স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে তুমি সর্বনামটি বেশি ব্যবহৃত হয়। 'তুমি' সর্বনামটি কখনো তিরস্কার অথবা বেয়াদবি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, একজন কলেজের বয়স্ক শিক্ষকের সাথে তার একজন ছাত্রের ভাষা ব্যবহার লক্ষ করা যেতে পারে।

ক. স্যার আপনার কাছে আমার একটু দরকার আছে।
খ. মোতাহার স্যার আপনার কাছে আমার একটু দরকার আছে।
গ. স্যার তোমার কাছে আমার একটু দরকার আছে।
ঘ. মোতাহার স্যার তোমার কাছে আমার একটু দরকার আছে।

উপরের 'ক'-নং বাক্যটি কুমারখালীতে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু 'খ', 'গ' এবং 'ঘ'-নং বাক্য তিনটি গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষকের নাম মোতাহার। কিন্তু ছাত্র শিক্ষকের সামনে শিক্ষকের নাম সরাসরি বলাতে কিছুটা বেয়াদবি হয়েছে। কুমারখালীতে গুরুজনের নাম তার সামনে বলাটা বেয়াদবি। 'গ'-নং বাক্যে শিক্ষকের নাম বলা হয়নি, তবে 'তুমি'র দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ 'তোমার ব্যবহার করায় সম্মান রক্ষিত হয়নি। 'ঘ'-নং বাক্যে নাম এবং 'তোমার' ব্যবহৃত হওয়ায় বাক্যটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। অর্থাৎ শিক্ষকের সাথে যেরকমভাবে কথা বলা উচিত, তা হয়নি। এই না হওয়ার জন্য শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি।

মা-বাবা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, বড়ভাই-বড়বোন অথবা পরিচিত গুরুজনেরা ছোটদের যে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন, তা নয়। বরং শিক্ষিত সমাজে 'তুমি' সর্বনামের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে বড়রা কখনও কখনও 'তুমি' সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দিয়ে গঠিত বাক্য দ্বারা কাউকে তিরস্কারও করে থাকেন। যেমন, একজন শিক্ষিত বয়স্ক ভদ্রলোক তার ভাই, ভাগ্নে ও ছেলের সাথে কথা বলছেন, কথা বলার সময় বয়স্ক শিক্ষিত ভদ্রলোক কোন একটি বিষয়ের প্রতি তার মতামত ব্যক্ত করলেন, কিন্তু তার ভাই, ছেলে, কিংবা ভাগ্নে তার মতের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে তাদের যুক্তি তুলে ধরল। শিক্ষিত ভদ্রলোক তার ভাই কিংবা ছেলেকে কিছু না বলে ভাগ্নেকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তুমি বড় প্রবক্তা হয়ে গেছ!" এই বাক্যটি সাধারণ বাক্য নয়, এজন্য যে ভদ্রলোকের ভাগ্নে উচ্চশিক্ষিত। তাছাড়া ভদ্রলোক আর কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু না বলে একজনের উদ্দেশ্যেই বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এটি একটি তিরস্কারমূলক বাক্য। বাক্যটির কয়েকটি রূপ দেওয়া যেতে পারে। যেমন:

ক. তুমি বড় প্রবক্তা হয়ে গেছ!
খ. তোমার কথা ঠিক না।
গ. তুমি না জেনে কথাটি বললে।
ঘ. তুমি আন্দাজে কথাটি বললে।
ঙ. তোমার কথা একদম ভুল।
চ. তোমার যুক্তিটা একদম অবাস্তব। ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণে খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ-নম্বরের বাক্যগুলি কুমারখালীর শিক্ষিত ভাষাভাষীদের কাছে গ্রহণযোগ্য এজন্য যে, বড়রা এরকম ভাষায় ছোটদের সাথে কথা বলতে পারেন। কিন্তু ক-নং

বাক্যটি অগ্রহণযোগ্য এজন্য যে, বাক্যটি যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তার মান রক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ থাকে, যা তার একান্তই নিজের। ভাষা ব্যবহৃত হয় মানুষের মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য। ভাষা ব্যবহৃত হতে হতে সামাজিকভাবে তার ব্যবহার রীতি গড়ে ওঠে। এই রীতির সঠিক প্রয়োগই ভাষার সাথে মানুষের গড়ে ওঠা প্রায়োগিক সম্পর্ক। যার দ্বারা রক্ষিত হয় 'ব্যক্তিত্ববোধ'। এই ব্যক্তিত্ববোধ রক্ষিত না হলে ভাষার ব্যবহার রীতির গড়ে ওঠা শৃঙ্খলা ঠিক থাকে না। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার রীতি ঠিক না থাকাই হলো ভাষা প্রয়োগের অগ্রহণযোগ্যতা।

ধনী ও বয়স্ক লোকদের সাথে কথা বলার জন্য কুমারখালীতে বিশেষ কোন সর্বনাম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। যেমন, ধনী এবং বয়স্ক লোক কিন্তু সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন নয়, এমন লোকও কুমারখালীতে বসবাস করেন। এ রকম লোকের সাথে যে সবাই 'আপনি' সর্বনাম ব্যবহার করেন তা কিন্তু নয়। কুমারখালীতে উচ্চশিক্ষিত এবং একই সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। তাই এরকম ভাষাভাষীদের সাথে কথা বলার সময় তুমি/তোমরা ব্যবহৃত হতে খুব একটা দেখা যায় না। সর্বনাম ব্যবহারে বয়সের বিষয়টি কুমারখালীতে কোন কোন ক্ষেত্রে অমূলক বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ পিতা-মাতা অথবা অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তি ছোটদের তুমি/তোমরা সম্বোধন করে থাকেন। একই সাথে ছেলেমেয়ে তার বাবা-মাকে অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে তুমি বলে সম্বোধন করে। এক্ষেত্রে সর্বনাম ব্যবহারের প্রসঙ্গটি বয়স কিংবা সামাজিক শ্রেণীকরণের মানদণ্ডে তুল্য হতে পারে না। তবে কুমারখালীতে শিক্ষিত পরিবারে বাবা-মা অথবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছোটদের 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু ছোটরা বাবা-মা কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে কখনও 'তুই' বলে সম্বোধন করেন না। ব্যতিক্রম হলো ছোট শিশুরা যারা ভাষার ব্যবহার জানে না। অর্থাৎ শিক্ষিতরা বড়দের 'তুই' বলে সম্বোধন করে না। কিন্তু আপনি/আপনারা, তুমি/তোমরা সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ ভাষার উপর যে প্রভাব ফেলে না, তা নয়। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে কাকে কোন অবস্থায় কোন পরিবেশে বলা হচ্ছে তাই বড় ব্যাপার। ছকে বাধা নিয়ম অথবা গাণিতিক সূত্র ভাষার ক্ষেত্রে অবাস্তব।

কুমারখালীতে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে 'আপনি করুন' ব্যবহৃত হতে খুব একটা দেখা যায় না। বরং ব্যবহৃত হয় 'আপনি করেন'। 'তুই করিস', 'তুই' সর্বনামের ক্ষেত্রে 'ইস' বিভক্তি সব সময় প্রযোজ্য নয়। কারণ 'তুই.কর' বাক্যের ব্যবহার হতে দেখা যায় অহরহ। কুমারখালীতে অতি কাছের বন্ধু যারা, তারা একে অপরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেন।

> বাঙলা সর্বনামের ব্যবহারে সম্ভাষিতের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, সম্পদ বা সম্পদহীনতার ভূমিকা অবশ্যই আছে— একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সর্বনামের ব্যবহার শ্রেণী নির্ভর কখনোই হতে পারে না। একই শ্রেণীর সম্ভাষক-সম্ভাষিতের মধ্যে তিন ধরনের সর্বনাম ব্যবহার অনায়াসেই চলতে পারে। সন্তানের পিতা-মাতাকে ('আপনি' বা) 'তুমি' বলে সম্বোধন করা কোনো শ্রেণীর দ্যোতক নয়, আবার

> পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করলেই তারা মধ্যবর্তী বা নিম্নবর্তী শ্রেণীতে পর্যবসিত হবে না। পিতামাতার শ্রেণীই সন্তানের শ্রেণী। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রে তাই বলে।[১০]

পিতা-মাতার শ্রেণী সবসময় যে সন্তানের শ্রেণী এমন ধারণা অমূলক। কারণ বাবা কিংবা মা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে সন্তানও তা হবে তা কিন্তু নয়। সন্তান চোর-ডাকাতও হতে পারে। তাই শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিক অর্জন মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পিতা-মাতার শ্রেণীর জন্য সন্তানের শ্রেণীগত অবস্থা সমাজে থাকলেও তা পরিবর্তন হতে পারে।

কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের সামাজিক স্তর বিন্যাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, কুমারখালীতে সামাজিকভাবে যারা পূর্ব থেকেই মর্যাদাসম্পন্ন তাদের বেশি সম্মানের চোখে দেখা হয়। সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন বলতে বংশীয় ও অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ব্যক্তিদের বোঝান হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণীবিন্যাস অনেক রকমের হতে পারে। যেমন :

ক. "ধারেও না ধারায়ও না"। সংসার মোটামুটিভাবে চলে যায় অর্থাৎ আয়-ব্যয় সমান থাকে।

খ. "ভাল অবস্থা"। সংসারের খরচ বাদে কিছু অর্থ জমা থাকে অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয় কিছু বেশি।

গ. "অবস্থা বেশ ভাল"। সংসারের খরচ বাদেও প্রতি বছর অনেক অর্থ জমা থাকে অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয় অনেক বেশি।

ঘ. "কোন রকম চলে যায়"। কিছুটা কষ্টসহকারে সংসারের খরচ চলে কিন্তু ধার করতে হয় না। অর্থাৎ ব্যয় বেশি কিন্তু আয় কম হওয়াতে ব্যয় সংকোচন করে চলতে হয়।

ঙ. "ধার দিনা করে চলে"। সংসারের খরচের জন্য কিছু টাকা ধার অথবা ঋণ নিতে হয়।

চ. "কষ্টের সংসার"। ধার অথবা ঋণ নেওয়ারও সংগতি থাকে না। অর্থনৈতিকভাবে বেশ কষ্টে থাকে যে পরিবারের লোকেরা। অর্থাৎ ধার বা ঋণ নিলে শোধ দেওয়ার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তা থাকে না।

ছ. "খেটে খাওয়া মানুষ"। দিনমজুর অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা প্রতিদিনের আয়ের উপর নির্ভর করে। প্রতিদিন কিছু আয়-রোজগার না করতে পারলে ঠিকমতো খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

জ. "ফকির শ্রেণী"। ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং পারলে মাঝে মধ্যে পরের বাড়িতে কাজ করে।

অর্থনৈতিক বিষয়টি সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে পারে না। ভাষার সাথে অর্থের বিষয়টি জড়িত। কুমারখালীর কিছু শিক্ষিত লোক যাঁরা দেশে ভালো চাকরি পায়নি তাঁদের কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির সন্ধানে গিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার কারণে তাঁরা কিছুটা আরবি শেখার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ টাকা রোজগার করার জন্য তাঁরা বাধ্য হয়েছেন আরবি শিখতে। ইংরেজির বিষয়টিও একই রকম। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ায় সবাই ইংরেজি শিখতে চায়।

ইংরেজি ভাষায় কথা বললে নিজের মর্যাদা কিছুটা বেড়ে যাবে তাও কেউ কেউ মনে করেন। ইংরেজি ভালো জানলে একটা ভালো চাকরি পাওয়া যাবে, এমন কথাও কেউ কেউ বলেন। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন হওয়ায় বাংলাদেশে বিদেশি ভাষার অবস্থান দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে।

কুমারখালীতে কোন গরিব ঘরের সন্তান শিক্ষিত হওয়ার পরেও ঠিক ততটা মূল্যায়িত হয় না, যতটা মূল্যায়িত হয় একজন ধনী ঘরের শিক্ষিত সন্তান। এই মূল্যায়িত হওয়া না হওয়ার জন্য ভাষার উপর তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। বি.এ. পাশ করে গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন এমন একজন শিক্ষিত লোকের সাথে অল্পশিক্ষিত গ্রামের লোকের কথা বলার ধরন নিম্নরূপ (অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসের ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ নম্বর অনুযায়ী ভাষিক প্রয়োগ দেখানো হয়েছে) :

ক নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "মাস্টার সাহেব ভালো আছেন?" (মর্যাদা ভালোভাবে রক্ষিত হয়েছে)

খ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "স্যার ভাল আছেন ?" (সম্মানজনক সম্বোধন)

গ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "স্যার কেমন আছেন ?" (অতি সম্মানজনক সম্বোধন)

ঘ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "মাষ্টের সাহেব, ভালো আছেন?" (মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে)

ঙ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "মাষ্টের ভাল তো ?" (স্বাভাবিক অর্থে, মর্যাদা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে)

চ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "মাষ্টের কেমন আছ ?" (স্বাভাবিক অর্থে কিন্তু মর্যাদা রক্ষিত হয়নি।)

ছ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "কি মাষ্টের কেমন আছ ?" (তুচ্ছের কাছাকাছি)

জ নং-এর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সম্বোধনের ভাষা : "কি মাষ্টের নাকি ?" (তুচ্ছ অর্থে)

সম্বোধনের ক্ষেত্রে ক্রমিক নম্বরের যে বিষয়টি দেখান হয়েছে তার ব্যতিক্রমও হতে পারে। নিজের ব্যক্তিত্ব ও পরিশ্রমের কারণে ক্রমিক নম্বর জ, ছ কিংবা চ, ক্রমিক নম্বর 'গ' নং-এ পৌঁছলে ধীরে ধীরে তার সাথে কথা বলার ধরন পরিবর্তন হতে পারে। অর্থাৎ সমাজে তিনি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। আবার ক্রমিক নং 'গ'-এর সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থা ক্রমিক নং 'ক', 'ছ' কিংবা 'জ'-এর স্তরে পৌঁছালে তার সাথে কথা বলার ধরনেরও পরিবর্তন হতে পারে।

কখনও দেখা যায়, একই পরিবারের আপন ভাই-বোনদের মধ্যেও কথা বলার ধরন রক্ষিত হয় না। চাকরি কিংবা ব্যবসার কারণে ভাই-বোনদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হতে পারে। বাড়ির

বড় সন্তান কিন্তু ছোট চাকরি করেন অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোট ভাই-বোনদের কিংবা বাবা-মাকে ঠিকমতো টাকা-পয়সা দিতে পারেন না। এ রকম ভাইয়ের সাথে ছোট ভাই-বোন মর্যাদা দিয়ে কথা বলেন না। কখনও দেখা যায় বড়ভাইকে 'তুই' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু ঐ পরিবারেই মেজ ছেলে বড় ব্যবসা কিংবা বড় চাকরি করে সে পরিবারের সবাইকেই টাকা-পয়সা দিতে পারেন এমন ভাইকে ছোটরা বেশ সম্মান করে, 'আপনি' বলে সম্বোধন করে। তাঁকে দেখে অন্যরা ভয় পায়, শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে আপনি, তুমি কিংবা তুই পরিবার ও বংশকে অতিক্রম করে অর্থের মানদণ্ডে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং জটিল মর্যাদার ভাষিক স্তরীকরণ পরিলক্ষিত হয়।

বংশের ব্যাপারটি বর্তমানে মুখ্য না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও বংশীয় পরিচয়ের পূর্বছায়া যে এসে পড়ে না, তা নয়। কুমারখালীর মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, মিয়া/মিঞা, খন্দকার, খান, মুন্শী, শেখ, মণ্ডল, সরকার, প্রামাণিক নানা রকমের বংশীয় শ্রেণীকরণ দেখা যায়। কুমারখালীতে বংশীয় বিষয়ে সৈয়দ এবং মিয়ার অবস্থান প্রথম দিকে। সৈয়দ ও মিয়া বংশের লোক ভাল ও সৎ হিসেবে বিবেচিত। সৈয়দ ও মিয়া বংশের যদি কেউ চোর, ডাকাত বা অন্য কোন অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলেও লোকে তাকে বলে ভালো বংশের ছেলে কিন্তু খারাপ লোকের সাথে মেশার কারণে খারাপ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুমারখালী এলাকার লোকেরা যে বংশের লোকদের ভদ্র হিসেবে মনে করতে চায় না অর্থাৎ 'চাষা-ভুষা' বলে সম্বোধন করে, তাদের ঘরের সন্তান কখনও খারাপ কাজ করলে বলে, "বংশ দেখতে হবে না ? ওদের পূর্ব পুরুষও ভাল ছিল না।" হিন্দুদের সমাজে বর্ণের বিষয়টি আরও জটিলরূপে অবস্থান করতে দেখা যায়।

হিন্দু সমাজে বর্ণের সাথে বর্ণ না মিললে বিয়ে পর্যন্ত হয় না। অর্থাৎ মেয়ে যদি কায়স্থ হয় তাহলে ছেলেকেও কায়স্থ হতে হবে। কখনও কখনও দেখা যায়, বর্ণের কারণে কোন উচ্চশিক্ষিত সুন্দরী মেয়েরও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তার থেকে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও অসুন্দর ছেলের সাথে। বিষয়টি ছেলের ক্ষেত্রে একই রকম ঘটে থাকে। হিন্দুদের সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পাল, পোদ্দার ঘোষ, রাজবংশী, মণ্ডল, সরকার নানা রকম বর্ণীয় শ্রেণীকরণ দেখা যায়। মুসলমানদের যেমন আপন ভাই-বোন ব্যতীত চাচাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন, ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে; অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের রীতি আছে, হিন্দু সমাজে তা অনুপস্থিত। তবে ইদানীং কুমারখালীতে হিন্দুদের এই বর্ণের বিষয়টিতে কিছুটা শিথিলতা চোখে পড়ছে। যোগ্য পাত্র-পাত্রীর স্বল্পতা ও অর্থনৈতিক কারণে বর্ণের রীতি-নীতির বিষয়টি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া পূর্বে হিন্দু ঘরের কোন ছেলে অথবা মেয়ে ভিন্ন ধর্মের ছেলে অথবা মেয়ে বিয়ে করলে সে আর তার বাবা-মায়ের বাড়িতে উঠতে পারত না। এমনকি ছেলেমেয়ের এ ধরনের কাজের জন্য পরিবারের অন্যদেরও কষ্ট ভোগ করতে হতো। হিন্দু সমাজের লোকরা ঐ পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ রাখত না, কথা বলত না। তাদের একঘরে করা হতো। বর্তমানে তারও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক এ সব পরিবর্তন ভাষা ব্যবহারের জগতে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলছে। বিস্ময়কর এই প্রভাব হলো, হিন্দু ছেলে অথবা মেয়ে বাবা, কাকা, মাসী, পিসি ইত্যাদি সম্বোধনসূচক সর্বনাম

ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আব্বা, চাচা, খালা, ফুফু ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করেন না। বিয়ের কারণে হিন্দুরা মুসলমান সমাজে অবস্থান করলে মুসলমানদের সম্বন্ধসূচক নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। কেউ কেউ নতুন ধর্মীয় আচরণও মেনে চলেন। ধর্মীয় আচরণ মেনে চললে তিনি আর হিন্দু থাকেন না। মুসলমান হয়ে যান। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন মুসলমানদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য।

কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যেমন 'জ' ধ্বনি কখনও কখনও 'চ' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। আবার 'জ' ধ্বনির উচ্চারণ রক্ষিতও থাকে। যেমন :

ক. আজ যাব না।
খ. আচ যাব না।

ক নং-এ 'জ' ধ্বনিটি খ নং-এ 'চ' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়েছে। 'জ' ধ্বনিটি তালব্য এবং ঘোষ স্বল্পপ্রাণ। অন্যদিকে 'চ' ধ্বনিটি তালব্য এবং অঘোষ স্বল্পপ্রাণ। শব্দ উচ্চারণের প্রতি সচেতন ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ লোকই 'আজ' শব্দটি 'আচ' উচ্চারণ করে থাকেন। তেমনি,

ক. কাজ করে খাও।
খ. কাচ করে খাও।

উপরের উদাহরণে 'ক' নং -এর 'কাজ' শব্দটি 'খ' নং-এ 'কাচ' উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও 'জ', ধ্বনি 'চ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের শব্দ উচ্চারণের যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তাতে 'জ' ধ্বনিটি 'চ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারিত হয় সহজাতভাবে এবং ভাধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই উচ্চারণের বিষয়টি ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া খুব একটা কারও নজরে আসে না। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে ঘোষীভবন এবং অঘোষীভবনের বিষয় রয়েছে। "কথা বলার সময় যখন ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসে, তখন স্বরতন্ত্রীগুলো কিছুটা বিশ্লিষ্ট হয়ে মুহূর্তের জন্যে উন্মুক্ত এবং রুদ্ধ হলে সজোরে কিছুটা বাতাস বেরিয়ে আসে এবং স্বরতন্ত্রীগুলোতে অনুরণনের সৃষ্টি হয়, ফলে ঘোষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। স্বরতন্ত্রীগুলো নিশ্চেষ্টভাবে থাকলে তাদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকে এবং ঐ উন্মুক্ত পথ দিয়ে নিঃশব্দে বাতাস যাতায়াত করে, এই অবস্থায় অঘোষ ধ্বনির সৃষ্টি হয়।"[১১] উপরের উদাহরণের ক নম্বরের 'কাজ'-এর 'জ' ঘোষ ধ্বনি এবং খ নম্বরে 'কাচ'-এর 'চ' অঘোষ ধ্বনি। অর্থাৎ 'জ' ঘোষ ধ্বনি অঘোষ 'চ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে :

ক → চ

উচ্চারণগত অসচেতনতার কারণে কখনো কখনো ঘোষ বর্ণ অঘোষ বর্ণে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ বর্ণের ঘোষত্ব লোপ পেতে পারে। এক্ষেত্রে, বর্ণের ঘোষত্ব লোপের কারণে, ঘোষ ধ্বনিকে

অপসারণ করে সে স্থলে নতুন অঘোষ ধ্বনি বসতে পারে। ক ও খ নম্বর উদাহরণে বিষয়টি দেখান হয়েছে। আবার 'জ' ধ্বনির উচ্চারণ রক্ষিতও থাকে। যেমন :

'জ' আছে এমন শব্দ	অর্থ
ক. আজিবর	লোকের নাম
খ. আজাইল	গ্রামের নাম
গ. অজু	ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ
ঘ. জবাই	গলা কাটা
ঙ. জমি	ভূমি ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণের আজিবর, আজাইল, অজু, জবাই এবং জমি প্রভৃতি উচ্চারণ রক্ষিত। অর্থাৎ 'আচিবর', 'আচাইল' 'অচু', 'চবাই', 'চমি' উচ্চারিত হয় না। তাহলে বলা যায় কুমারখালীতে 'জ' ধ্বনিটি অসচেতনতাবশত কখনও কখনও 'চ' ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। আবার রক্ষিতও থাকে।

শিক্ষিত লোকদের শব্দ উচ্চারণে আরও বৈচিত্র্য আছে। যেমন, 'স্তর' শব্দটি নানাভাবে উচ্চারিত হতে পারে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, শিক্ষার যে স্তরীকরণ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত কিংবা মোটামুটি শিক্ষিতের বিষয়টি উচ্চারণের জগতে সব সময়ই যে প্রভাব ফেলে তা কিন্তু নয়। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, যোগাযোগ ও কর্ম উচ্চারণের ক্ষেত্রে বড় রকমের ভূমিকা পালন করতে পারে। কুমারখালীতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণের তারতম্য লক্ষ করা যায়। 'স্তর' শব্দটির উচ্চারণের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। যেমন :

ক. স্তর	প্রমিত রূপ
খ. ইচ্তর	উচ্চারণ বৈচিত্র্য
গ. ইছ্তর	উচ্চারণ বৈচিত্র্য
ঘ. ইস্তর	উচ্চারণ বৈচিত্র্য ইত্যাদি।

উচ্চারণ বৈচিত্র্য থাকলেও কুমারখালীর শিক্ষিত লোকদের ভাষা শিষ্ট বা প্রমিত ভাষার বেশ কাছাকাছি অবস্থান করে এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রমিত ভাষার মতোই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রমিতের মতো ব্যবহৃত হয় সাধারণত অধিক সচেতন ভাষাভাষীর ভাষা। কুমারখালীর ভাষার বিষয়ে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো,

> সেন রাজাদের সময়ে রাজধানী নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপনিবাসী শ্রী চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাহা বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র হইয়া উঠে। ষোড়শ শতকের *চৈতন্যভাগবতে* বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :
>
> নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
> নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়॥
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
এ সময় হতেই নদীয়ার ভাষা বাংলার সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠে।[১২]

বাংলা ভাষা যা পণ্ডিত ব্যক্তিদের কঠোর পরিশ্রমে সাহিত্যের ভাষা বা বইপত্রের ভাষা হয়ে ওঠে তার যে কেন্দ্রীয় শাখা ছিল তা হলো,

> কেন্দ্রীয় শাখা—কলিকাতা, হাওড়া, তমলুক ও ঘাটাল (মেদিনীপুর জেলা), নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কটোয়া মহকুমা (বর্ধমান জেলা)। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার কথ্যভাষা (যা পূর্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল)।[১৩]

কুমারখালীতে এক সময় হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় হিন্দুদের জন্য ভারত এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান এমন ধরনের ভাবাবেগ কাজ করায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বসতি স্থাপনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও মানুষের আবাস স্থলের পরিবর্তনগত চিত্র অনুপস্থিত নয়। এসব কারণে কুষ্টিয়া তথা কুমারখালী এলাকায় যে আদর্শ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতো বা হয়ে আসছিল তার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ, যেমন কিছু মানুষ কুমারখালী থেকে অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করেছেন, ঠিক তেমনি কিছু মানুষ কুমারখালীতে নতুনভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। মানুষের বসতি স্থাপনের সাথে ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় যেখানেই যাক না কেন সে ভাষার মতো অমূল্য সম্পদ সাথে নিয়ে যায়। ভাষার শুদ্ধতা/অশুদ্ধতার প্রসঙ্গটি এর সাথে সম্পৃক্ত। কুমারখালীতে ভাষার যে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তা এই বসতি স্থাপনের সাথে সংযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

কুমারখালীতে এমন কিছু শব্দ আছে যা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এবং এ সব শব্দ কুমারখালীর লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, 'কথা' শব্দটি নানা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নানা অর্থ প্রকাশ করে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, কখনও কখনও 'কথা' শব্দটি হুবহু ব্যবহৃত না হয়ে কথার অর্থগত রূপটি বাক্যে উপস্থিত থাকে। যেমন :

ক. আস্তে আস্তে কথা।
খ. জোরে জোরে কথা।
গ. চেচামেচি করা।
ঘ. শোরগোল করা।
ঙ. ধীরে ধীরে কথা।
চ. চিবিয়ে চিবিয়ে কথা।
ছ. ফিসফিস করা।
জ. চিৎকার করা।

ঝ. কানে কানে কথা।

ঞ. আবোল-তাবোল কথা।

ট. গাঁজাখুরে কথা। ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণে ক, খ, ঙ, চ, ঝ, ঞ এবং ট নম্বর বাক্যে 'কথা' শব্দটি হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গ, ঘ, ছ এবং জ নম্বর উদহরণে 'কথা' শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু 'কথা' শব্দটি হুবহু ব্যবহৃত হোক কিংবা না হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'কথা' শব্দের উপস্থিতি বর্তমান। 'কথা' শব্দটি কুমারখালীতে ছেলে/মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহৃত এবং সাইনবোর্ডের ভাষায়ও কথার ব্যবহার লক্ষণীয়। কুমারখালী শহরের একটি দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'কথা ডায়াগনোসিস সেন্টার'। অর্থাৎ ভাষায় একটি শব্দের নানা রকম প্রয়োগ কুমারখালীতে দেখা যায়।

ভাষা মানব মনের দর্পণ। ভাষা সহজাত। ছোটবেলা থেকে মানব শিশু যে সমাজে বড় হয়ে থাকে, শিশু সে সমাজের ভাষাই শিখে থাকে। ভাষার প্রচলিত রূপ সেক্ষেত্রে অনেকাংশেই পাশে থেকে যায়। সার্বিক অর্থে বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। চট্টগ্রামের ভাষা, নোয়াখালীর ভাষা, ময়মনসিংহের ভাষা, কুষ্টিয়ার ভাষা—সবই বাংলা ভাষা। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা এক নয়। কিন্তু প্রমিত বাংলা ভাষা সব এলাকার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য এবং প্রতিটি এলাকার ভাষাই এক। এর কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রমিত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে থাকেন এবং তাঁদের নিজের কাজে তা ব্যবহার করেন। তবে শিক্ষিত হলেও নিজ নিজ এলাকার ভাষা, নিজস্ব এলাকার অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরাই ব্যবহার করে থাকেন। কুমারখালীর ভাষা প্রমিত ভাষার কাছাকাছি হলেও সেখানে যে সম্পূর্ণরূপে প্রমিত ভাষা ব্যবহৃত হয়, তা নয়। আঞ্চলিকতার বিষয়টি কুমারখালীতেও রয়েছে। তবে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন প্রয়োগ ও অসচেতন প্রয়োগের বিষয়টিও রয়েছে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো, নিজেকে আধুনিক ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা। ভাষার প্রয়োগ এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষিত হলেও কুমারখালীর জনগোষ্ঠী নিজ এলাকায় ভাষা ব্যবহারের সময় আঞ্চলিক ভাষাকে খুব একটা পাশে রেখে দেয় না।

তথ্যনির্দেশ

১. ওয়াকিল আহমদ, 'লালনের গানের পাঠ-সমীক্ষা' *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৩, জুন ২০০০, সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ.১

২. *১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা* (১৮৬৯-১৯৯৪), কুমারখালী পৌরসভা, কুষ্টিয়া, ১৯৯৪, পৃ. ৪২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

৬. কুমারখালীর রাজাপুর গ্রাম থেকে বাক্যটি ৩ জানুয়ারি ২০০০ তারিখ বিকেল ৪টার সময় সংগ্রহ করা হয়েছে। বাক্যটি যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁর নাম মোছাঃ রাবেয়া খাতুন, বয়স ত্রিশ, নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। বিবাহিত, দু সন্তানের মা, গৃহিণী।

৭. কুমারখালীর কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে বাক্যটি ৪ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময় সংগ্রহ করা হয়েছে। বাক্যটি যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম মোঃ দাউদ হোসেন খান, বয়স ৫০, এম কম পাস, বিবাহিত, তিন সন্তানের পিতা, শিক্ষকতা করেন।

৮. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ১৩৯

৯. রাজীব হুমায়ুন, *সমাজ ভাষাবিজ্ঞান*, দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২-৩৩

১০. মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪২

১১. রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতত্ত্ব*, বুক ভিউ, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৪৭

১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাংলাদেশী বাংলার আদর্শ অভিধান : ভূমিকা', *বাঙলা ভাষা* (২য় খণ্ড), হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ২৯০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২